সংবাদ

তারিখ 26 APR 2017 পৃষ্ঠা ৬ প্রাপ্তি নং 8
চীফ ...
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রসঙ্গে

মো. রফিকুল ইসলাম

ফেব্রুয়ারি ২০১৭-এ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে রাজধানীর ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, সরকারি কবি নজরুল কলেজ, বেগম বদরুন্নেছা সরকারি কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত অবস্থা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়েছে। পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, অধিভুক্ত অবস্থার পরিবর্তনের ফলে উক্ত ৭টি কলেজের ২ লাখ শিক্ষার্থী বিপাকে পড়েছে। উক্ত ৭টি কলেজকে ঢাবি অধিভুক্ত করার পর ঢাবির ভিসি ১৬/০২/২০১৭ তারিখে উল্লিখিত কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে সভা করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কলেজ পরিচালনার কোন প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও সেরূপ কোন কার্যক্রম শুরু করার কথা জানা যায়নি। অপর দিকে, জাবি বলেছে, কলেজগুলো ঢাবি অধিভুক্ত হওয়ার পর পরীক্ষা অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। ইতোমধ্যে জাবি তাদের ওয়েবসাইট থেকে কলেজে সমূহের নাম ও অন্যান্য তথ্য মুছে ফেলেছে। এমতাবস্থায়, উক্ত ৭টি কলেজের ২ লাখ শিক্ষার্থী তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন।

আমরা মনে করি, এ বিষয়ে জাবি ও ঢাবির মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব ও কার্যক্রম হস্তান্তরের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকলে এরূপ সমস্যা এড়ানো সম্ভব হতো।

রাজধানীর কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষ পরিবর্তনের ঘটনা ইতিপূর্বেও ঘটেছে। ঢাবি ও জাবির ইতিহাসের দিকে আলোকপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, ঢাবির প্রতিষ্ঠা ও ঢাকার কলেজগুলোর কর্তৃত্বভার গ্রহণের ক্ষেত্রে ঢাবিকে অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে। ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের জনগণ বিশেষত মুসলমানদের নিকট এ অঞ্চলের উন্নতির প্রত্যাশা জন্মায়। তারা বঙ্গভঙ্গকে সাদরে গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় তাদেরকে খুশি করা এবং এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য বৃটিশ সরকার ১৯১২ সনে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা কেন্দ্রিক পেশাজীবী এবং বুদ্ধিজীবীগণ এর বিরোধিতা করে আসছিল। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের জনগণের আন্দোলন, সভা সমাবেশ, এবং ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাবের প্রেক্ষিতে কলকাতা কেন্দ্রিক বিরোধিতাকারীগণ ঢাকায় শুধু একটি একক শিক্ষাক্ষেত্র ও নন-অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

এ ব্যবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পরও পূর্ব বঙ্গের মাধ্যমিক ও স্নাতক শিক্ষার উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই কর্তৃত্ব থেকে যায়। সর্বশেষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র ঢাকা শহরের কলেজগুলোকে এর অধিভুক্ত রেখে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। সে হিসেবে তৎকালীন ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, মোহামেডান কলেজ, উইমেন্স কলেজসহ ৭ (সাত) টি কলেজ এর অধিভুক্ত হয়। পূর্ব বাংলার অন্যান্য কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তই থেকে যায়। ১৯৪৭ সনে ভারত ও পাকিস্তান নামক ২টি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যে বিশেষ পরিবর্তন আসে। ১৯৪৭ সনে পূর্ব বাংলা শিক্ষা অর্ডিনেন্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কাম-শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এফিলিয়েশন ব্যবস্থা যোগ করলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৫৫টি কলেজের এফিলিয়েশন ও তত্ত্বাবধানের ভার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত মৌলিক কোন পরিবর্তন না হলেও কলেজের সংখ্যা বাড়ে।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতীয় চেতনার জাগরণের প্রেক্ষিতে জনগণের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতা উত্তর কালে সরকারের উৎসাহ ও সহযোগিতায় সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরো অনেক বেড়ে যায়। ১৯৮৫ সনে বাংলাদেশে মোট ৪৬২টি ডিগ্রি কলেজ ছিল। ঐগুলোর মধ্যে ৪৩টি কলেজে স্নাতক সম্মান কোর্স এবং ১২টি কলেজে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু ছিল। কলেজগুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে Affiliate ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে আসছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজ নিজ পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে অধিভুক্ত কলেজগুলোর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে আসছিল। ফলে উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল এবং Affiliated কলেজগুলোর তত্ত্বাবধানও সঠিক হচ্ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গুলোর শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর কলেজগুলোতে শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের জন্য ডঃ কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন দেশের প্রত্যেকটি প্রশাসনিক বিভাগে একটি করে মোট ৪টি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় (Affiliate University) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে।

ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের আলোকে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি দেশে একটি অনুমোদনকারী Affiliate বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে। মঞ্জুরী কমিশন প্রতিবেদনটি পর্যালোচনার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করে। ১৯৯২ সনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের সকল ডিগ্রি কলেজ, আইন শিক্ষা ও সংগীত শিক্ষা এবং আর্ট কলেজসমূহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। অধিভুক্ত কলেজগুলোর পাঠ্যক্রম তৈরি ছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের প্রসার, আধুনিকায়ন, গবেষণামূলক কাজ ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি প্রদানের কাজ করে থাকে। ২০১৬ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের কলেজ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এ সময় পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আওতাধীন সাধারণ কলেজের সংখ্যা ৩১৫০টি, এর মধ্যে ২৫২টি সরকারি এবং ২৮৯৯টি বেসরকারি। এ সমস্ত কলেজ হতে স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠদান সম্পন্ন হচ্ছে।

সারা দেশে কলেজ পর্যায়ে স্নাতক (পাশ), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সঠিক সংখ্যা আমাদের জানা নেই। তবে বক্ষমান নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকার আলোচ্য ৭টি কলেজ এ দুই লক্ষ শিক্ষার্থী রয়েছে। তাছাড়া, জেলা পর্যায়ের প্রতিটি বড় বড় সরকারি কলেজ ২০/২৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তার শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং তাদের পাঠদান কার্যক্রম তথা সিলেবাস প্রণয়ন, প্রশ্ন তৈরি, পরীক্ষা অনুষ্ঠান, ফল প্রকাশ কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নের জন্য যথাযথ তত্ত্বাবধান এককভাবে জাবির পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না। দিন দিন জাবির অধিভুক্ত কলেজ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি অধীত বিষয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ-সমস্ত কলেজের উপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষার মানও দিন দিন কমে যাচ্ছে। দীর্ঘ সেশনজটের সৃষ্টি হয়েছে। কলেজ সমূহের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের কোটারী স্বার্থের কারণে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবে ধারণ ক্ষমতার অনেক বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। শিক্ষা ও শ্রেণী কক্ষের অভাবে ক্লাস হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানে ১০০/১৫০ জন শিক্ষার্থী ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বড় কোন শ্রেণী কক্ষ না থাকলেও একটি সেকশনে ৩০০/৪০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত দাঁড়াচ্ছে ১:১৬০/২০০ এর কাছাকাছি, কখনও আরো বেশি। ফলে পড়ার পরিবেশ থাকছে না। শিক্ষকরা ক্লাস করান না। শিক্ষার্থীরাও ক্লাসে আসে না। ৪ বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সে ২০/২৫ দিন ক্লাস না করেও শিক্ষার্থীরা কোর্স শেষ করতেছে। এতে কলেজগুলো পরিণত হয়েছে পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদপত্র বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানে। সহজ পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে কলেজগুলোতে পাঠদান কার্যক্রম হ্রাস পেলেও পরীক্ষায় পাসের হার ও উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির হার বেড়েছে।

এ প্রসঙ্গে আলোচ্য লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা যেতে পারে। তার বেসরকারি পর্যায়ে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক শাখায় পাঠদানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন জেলা পর্যায়ের সরকারি কলেজে অনার্স/মাস্টার্স-এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এ সমস্ত শিক্ষকগণ নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছে। তারা শুধু পরীক্ষার দিন প্রতিষ্ঠান থেকে ছুটি নিয়ে নিজ নিজ কলেজে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। পাঠদান কার্যক্রমে তাদেরকে সে রকম মেধাবী মনে না হলেও তাদের কেউ কেউ জাবির অধীন স্নাতক (সম্মান), মাস্টার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণী পেয়েছে। লেখকের পূর্বতন পেশা, সরকারি চাকরি ও বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বের অংশ হিসেবে অনেক নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনার সুযোগ হয়েছে। এরূপ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, চাকুরী প্রার্থীদের একাডেমিক রেকর্ডের সঙ্গে নিয়োগ পরীক্ষায় অর্জিত ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে, সামগ্রিকভাবে কলেজ শিক্ষার মানের অধোগতির ধারণার সঙ্গে বর্তমান লেখক একমত।

জাবির শিক্ষার মানের অধোগতির প্রেক্ষাপটে জাবির পুনর্গঠন কিংবা জাবি প্রতিষ্ঠার পূর্বের ন্যায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কলেজ শিক্ষা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্ভবত প্রাথমিকভাবে বা পরীক্ষামূলক ভাবে ঢাকা শহরের আলোচ্য ৭টি কলেজ এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ঢাবিকে দেয়া হয়েছে। সরকারসহ শিক্ষানুরাগী সচেতন মহলের প্রত্যাশা যে, নতুন এ ব্যবস্থায় উল্লেখিত কলেজগুলোর শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে।

ঢাবির অধিভুক্ত হওয়ার পর এ সাতটি কলেজের শিক্ষার মানের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হবে কি না,- সেটি নির্ভর করে ঢাবির গৃহীত কার্যক্রমের উপর। ইতোমধ্যে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, উক্ত সাতটি কলেজের ২ (দুই) লক্ষ শিক্ষার্থী বিপাকে পড়েছে। তাদের শিক্ষা কার্যক্রম ও পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এতসংক্রান্ত আদেশ জারির পর ঢাবির ভিসি ৭টি কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে সভা করেছেন ফেব্রুয়ারীর ১৬ তারিখ। উক্ত সভায় কি সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা আমরা জানি না। কখন থেকে ও কি ভাবে ঢাবি উক্ত কলেজগুলোর পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে, তা এখনও স্পষ্ট করা হয়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষও শিক্ষার্থীদের তা জানায়নি। আমরা মনে করি, ঢাবি অবিলম্বে অধিভুক্তকরণের স্তরগুলোকে চিহ্নিত করে ঐ সমস্ত স্তরগুলো কখন ও কিভাবে সম্পন্ন করা হবে, তা সংশ্লিষ্ট কলেজ ও শিক্ষার্থীদের জানানো দরকার। আমরা আরো মনে করি, জাবির এখনই এ সমস্ত কলেজের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নেয়া সঠিক হয়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ কলেজগুলোতে প্রত্যেক বৎসর স্নাতন (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে নতুন নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। একই ভাবে প্রত্যেক বছর সংশ্লিষ্ট শ্রেণী পাশ করে শিক্ষার্থীগণ বেড়িয়ে যাচ্ছে। ঢাবি এর অধিভুক্ত ৭টি কলেজের স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সিলেবাস তৈরি, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ জাবি করে আসছে। জাবি কর্তৃক শুরু করা শিক্ষা কার্যক্রম জাবি সমাপ্ত করলেই ভাল হয়। সে হিসেবে ইতোমধ্যে যে সমস্ত শিক্ষার্থী জাবির আওতায় উক্ত ৭টি কলেজে বিভিন্ন কোর্সে অধ্যয়ন করছে, তাদের কোর্সগুলোর প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষাগ্রহণ ও ফল প্রকাশের কাজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় করতে পারে। সর্বশেষ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর কোর্স সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে আপনা আপনিই জাবির দায়িত্ব শেষ হবে। একইভাবে ২০১৭ সনে যে সমস্ত শিক্ষার্থীগণ স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি করে সিলেবাস প্রণয়ন, কোর্স নিধারণ, প্রশ্ন পত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশসহ সকল কার্যক্রম ঢাবি এর আওতায় পরিচালিত হবে। এ প্রক্রিয়ায় অধিভুক্ত গ্রহণ সমাপ্ত করতে কয়েক বছর সময় লাগলেও প্রক্রিয়াটি মসৃণ ভাবে সম্পন্ন হবে। জাবির দায় ঢাবিকে নিতে হবে না। পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়সহ অন্যান্য সমস্যা দেখা দিবে না। প্রতিষ্ঠান দুই মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা কমবে।

ঢাকার ৭টি সরকারি কলেজের দায়িত্বভার জাবি থেকে ঢাবির নিকট যাওয়াই বড় কথা নয়, বড় কথা হল, কলেজগুলোর শিক্ষার মানের উন্নয়ন। ঢাবিকে এ সফলতা অর্জন করতে হলে অবিলম্বে কলেজগুলোর সমস্যাকে চিহ্নিত করা আবশ্যক। সমস্যা চিহ্নিত করতে পারলেই তা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে। ঢাবি একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে ৭টি কলেজের সমস্যা চিহ্নিতকরণের কাজটি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমরাও কলেজগুলোর কতিপয় সমস্যা ও তা সমাধানের বিষয়ে আলোকপাত করতে পারি।

নিবন্ধের শুরুতে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত ৭টি কলেজের ২ (দুই) লক্ষ শিক্ষার্থী বিপাকে পড়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত ৭টি কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ (দুই) লক্ষ। শিক্ষার্থীর সংখ্যা যদি তাই হয়ে থাকে, তবে বলতে হবে যে, শিক্ষার্থীর ভারে কলেজগুলো নুয়ে নয়, বরং মাটিতে শুয়ে পড়েছে। আমাদের ধারণা ৭টি কলেজ যে পরিমাণ জায়গা রয়েছে, সে পরিমাণ জায়গায় ২ (দুই) লক্ষ শিক্ষার্থীর দাঁড়ানোর স্থানই সংকুলান হবে না। সুস্থ্য ও স্বাভাবিক ভাবে পড়াশুনা করার তো প্রশ্নই আসে না। এ সমস্ত কলেজে পড়াশুনার পরিবেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ঢাবির প্রথম কাজ হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা আনা। প্রতিটি কলেজে অবকাঠামো অনুসারে শিক্ষার্থী ভর্তি করা। প্রত্যেকটি শ্রেণী ও শাখাতে অন্তত প্রতিদিন যেন ৫ (পাঁচ) টি ক্লাস করার মত শিক্ষক ও শ্রেণী কক্ষের সংস্থান থাকে, তা নিশ্চিত করা। মনে রাখা দরকার, শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় পাঠদান শিক্ষার মান উন্নয়নের আবশ্যকীয় অংশ।

৭টি কলেজের মধ্যে ইডেন মহিলা কলেজ ব্যতীত সকল কলেজে এইচএসসি কোর্স চালু রয়েছে। এইচ,এস,সি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা নয়। তার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের হাতে। উল্লেখিত কলেজগুলোতে এইচএসসি কোর্স চালু থাকলে এদের উপর ঢাবি ও শিক্ষাবোর্ড উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব থাকবে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্বৈত প্রশাসন বলবৎ থাকবে। শিক্ষাবোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম এবং ঢাবি এর বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণে এইচএসসির শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয়। এতে শিক্ষার উভয় স্তরই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া, এসমস্ত কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ের রাখার ক্ষেত্রে এইচএসসি কোর্স না থাকা ঢাবিকে সহায়তা করবে। কিন্তু কলেজগুলোতে এইচএসসি কোর্স অব্যাহত রাখার জন্য ঢাবি ওপর প্রচন্ড চাপ আসবে। এ চাপটি প্রধানত আসবে কলেজ প্রশাসন তথা শিক্ষকদের কাছে থেকে। এভাবে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির সংগে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। তারা স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে এতে জড়ায়ে ফেলতে পারে।

সরকারি কলেজে আরো একটি বড় সমস্যা হল শিক্ষক সংকট। শিক্ষক স্বল্পতার পাশাপাশি শিক্ষকদের যোগ্যতা ও আন্তরিকতার প্রশ্নটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যোগ্যতার শিক্ষকের সমাবেশ ঘটেছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের তদবিরের জোর বেশি। এ ছাড়াও, রয়েছে রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্পন্ন শিক্ষক। বাস্তব কারণেই উল্লেখিত ৭টি কলেজে, আলোচ্য ধরনের শিক্ষকের সংখ্যাও কম নয়।

আরো একটি প্রসঙ্গ আছে। সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষক নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি তাদের ছুটি, তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অথচ কলেজগুলো পরিচালনা করবে ঢাবি। এখানে কর্তৃত্বের দ্বৈততা পরিলক্ষিত হবে। এ সমস্যাটির সুরাহা করা আবশ্যক হবে। এ সমস্ত কলেজগুলোতে শিক্ষক পদস্থ করণ, বদলি, পদোন্নতি এবং তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঢাবির একটি ভূমিকা থাকতে হবে। এ বিষয়ে একটি কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করা আবশ্যক হবে।

আমাদের বিবেচনায় ঢাবির অধিভুক্ত ৭টি কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নতকরণের মাধ্যমে জাবির অধিভুক্ত কলেজগুলো হতে স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে ঢাবিকে প্রাথমিকভাবে কলেজগুলোতে স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে আসন সংখ্যা তাদের ধারণ ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে; এইচএসসি কোর্স বন্ধ করতে হবে এবং শিক্ষক ব্যবস্থাপনার মতো কাজগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

অন্যথায় সরকারের এ পরিকল্পনা ও প্রত্যাশা গুড়ে বালিতে পরিণত হবে। ঢাবির অধিভুক্ত হলেও কোন সুফল পাওয়া যাবে না। কলেজগুলোকে পুনরায় জাবির অধিভুক্ত করার দাবি উঠবে। ঢাবির সুনাম ক্ষুণ্ন হবে।

[লেখক : প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, রফিকুল ইসলাম স্কুল এন্ড কলেজ, ডেমরা, ঢাকা]